সরকারের বস্ত্রনীতির কল্যাণে লাখ লাখ লোক বিবস্ত্র

৭ একা বোম্বাই প্রদেশে ৫৫ হাজার শ্রমিক বেকার

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রবিবার ১লা জানুয়ারী ১৯৫০, ১৭ই পৌষ, ১৩৫৬ | মূল্য—দুই আনা

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে, "বর্ত্তমানে দেশে সুতাবস্ত্রের কোন অভাব নেই", এই কথা বলে নিজেদের বস্ত্রনীতির খুব তারিফ করেছেন। নিজেদের নীতির প্রশংসা তাঁরা অবশ্যই করতে পারেন কিন্তু জনসাধারণের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারী তথ্য বিভাগই প্রচার করেছে, যুদ্ধের আগে প্রত্যেক ভারতবাসী মাথা পিছু গড়ে যেখানে ১৮ গজ কাপড় ব্যবহার করত সেখানে ১৯৪৭-৪৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১ গজে। এই যে ব্যবহার হ্রাস একি সরকারী বস্ত্রনীতির সাফল্যের পরিচয় দেয়, না তার উল্টোটাই প্রমাণ করে? গত বছরে এই ছিল অবস্থা; বর্ত্তমান সালে অবস্থা আরও খারাপ কারণ গত বছরের তুলনায় এবার কাপড়ের উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। আগের বছর অধিক মাল উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে আসেনি কাপড়ের দাম; এবার তার চেয়ে কম উৎপাদিত হওয়ায় অবস্থাটা আরও খারাপ হতে বাধ্য। বস্ত্রনীতি বিবেচনা করতে হলে এসব কথা না ভেবে উপায় নেই।

এই কয়েক মাস আগেও Produce or Perish এই আওয়াজ তুলে কম উৎপাদনের জন্য সমস্ত দোষ শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল সরকার ও মালিকপক্ষ; অথচ আজ দেশে কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও মালিকপক্ষ মিথ্যা অজুহাতে যখন উৎপাদন জোর করে কমিয়ে দিচ্ছে সিফট তুলে দিয়ে কিংবা একের পর এক কাপড়ের কল বন্ধ করে দিয়ে তখন সরকার একেবারে নির্বাক। শুধু তাই নয় মালিকের এই কাজে সহায়তাও করে চলেছে। মালিকের ও সরকারের এই জাতিদ্রোহী নীতিতে একা বোম্বাই প্রদেশেই ৫৫ হাজারের মত সুতাকল মজুর বেকার হয়ে পড়েছে। আর এই বেকারত্ব শুধু সুতাকলের মধ্যেই নয় প্রতিটি শিল্প, ব্যবসায়, সরকারী ও বেসরকারী অফিসে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ছাঁটাই হচ্ছে; ফলে অর্থনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্ঠ ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ছে এবং তাদের মাথা পিছু বছরে গড়ে ১১ গজ কাপড় ব্যবহার করার মত সঙ্গতিও থাকছে না। একথা পুঁজিপতি শ্রেণীর মুখপাত্র বিড়লার Eastern Economist পত্রিকাও না স্বীকার করে পারে নি। তারই মতে ১৯৪১-৪২ সালে যেখানে গড়ে প্রতিজন ভারতবাসীর আয় ছিল ২৮৩, ১৯৪৬-৪৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৩৭তয়ে বর্ত্তমানে সেই হিসাবে ২০০র মত। সুতরাং মন্ত্রীরা নিজেদের কাজের মতই প্রশংসা করুন—বাস্তবে আমরা দেখছি সরকারী বস্ত্রনীতির কল্যাণে একদিকে লাখে লাখে বেকার হয়ে নিঃস্ব হতে নিঃস্বতর হওয়ায় স্বাভাবিক বাজার দরেও কাপড় কেনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে অন্যদিকে পুঁজিপতির দল কাপড়ের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে, উৎপাদিত মাল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় গুদামে ও মিলে আটকে রেখে অনেক বেশী দামে বাজারে কাপড় ছাড়ছে এবং চাহিদার তুলনায় যোগান অনেক কম করিয়ে জনতাকে বেশী দামে কিনতে বাধ্য করছে। এই জমান মাল দেখেই ডাক্তার সাহেব বলেছেন—বাজারে কাপড়ের অভাব নেই।

তারপর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় চাহিদা অনুযায়ী বাজারে মাল আছে তাহলে মন্ত্রীমশায়দের জিজ্ঞাস্য বাজারে কোটি কোটি গজ কাপড় থাকার কি মূল্য আছে যদি জনতার সে কাপড় কেনার ক্ষমতা না থাকে? যদি বিবস্ত্র হয়ে তাদের দিন গুজরাতে হয়? সারাবছরে ভারতবাসী জন প্রতি ১১ গজ কাপড় ব্যবহার করে—এর মধ্যে অবস্থাপন্নের দলেদের ব্যবহারও ধরা হয়েছে। তারা এই সামান্য পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী ব্যবহার করার পরও যখন গড় এত কম তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মেহনতকারী ভারতবাসী এই গড়ের চেয়ে কম ব্যবহার করে। আসলে শ্রমজীবি অংশের ভাগে

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

রামরাজত্বে সুখের নমুনা

অভাবের তাড়নায় অর্থাভাবে অন্নভাবে

★ মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীর ছাদ হইতে লাফাইয়া আত্মহত্যা
★ স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গে আগুণ লাগাইয়া আত্মহত্যা
★ চাষীর অনাহারে মৃত্যু
★ যুবকের ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যার চেষ্টা

কংগ্রেসী রামরাজত্বে জনসাধারণ যে কত সুখে আছে তাহার প্রমাণ প্রতিনিয়তই মিলিতেছে। প্রতিদিন জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হইতেছে অথচ আয় বাড়িতেছে না উপরন্তু সরকারী শ্রমনীতির কল্যাণে লাখে লাখে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক চাকুরী হারাইয়া বেকার হইয়া পড়িতেছে—পরিবার প্রতিপালনের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বাধ্য হইয়া আত্মহত্যা করিয়া দুর্বহ জীবন হইতে মুক্তি খুঁজিতেছে। মানুষ কত নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইলে আত্মহত্যা করে তাহা লাখ লাখ টাকার মালিক, প্রাসাদবাসী কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী বুঝিবে কি করিয়া? জনজীবনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকিলে এই ধরণের একটি ঘটনা তাহাদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিত। কিন্তু মন্ত্রীদের অর্থ যেখানে ব্যক্তিগত বা উপদলগত স্বার্থসিদ্ধি সেখানে হাজারে হাজারে এই-ঘটনা ঘটিলেও মন্ত্রীদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না। কংগ্রেসী শাসন তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আজ পর্য্যন্ত কোন সভ্য দেশেই সরকারের পক্ষে এই জাতীয় উদাসীনতা ও অগ্রাহ্য লক্ষ্য করা যায় নাই। অথচ সভ্যতা গর্বী ভারত সরকার ভারতবাসীরা কত সুখে আছে তাহার মধুর ছবি আঁকিয়া বিদেশে পুরাদমে প্রচার চালাইলেও ইহার জন্য এতটুকুও নৈতিক দায়িত্ব বোধ করে না।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসের জনৈক প্রাক্তন কর্মচারী দশ মাস কাল ছুটীতে থাকিবার কালে বেতন না পাইয়া অর্থাভাবে পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারে দশজন পোষ্যকে যে সামান্য বেতন তিনি পাইতেন তাহাতে কোন রকমে ভরণপোষণ করিয়া যাইতেন। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কপালে যাহা হয় তাঁহারও হইল তাহাই—রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। রোগমুক্ত হইয়া কাজে যোগ দিতে যাইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কাজে যোগ দিতে বারণ করে এবং যে পর্য্যন্ত না সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড তাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দিতেছে ততদিন তিনি কাজে যোগ দিতে পারিবেন না—বলিয়া জানাইয়া দেয়। যথারীতি মেডিক্যাল বোর্ড তাঁহাকে পরীক্ষা করিল; কিন্তু কি তাহার ফলাফল তাহা কেহই জানিল না। মাসের পর মাস কাটিয়া চলিল। পূর্ণ বাবু দরখাস্তের পর দরখাস্ত করিয়া চলিলেন, ব্যক্তিগত দেখা করিলেন কিন্তু

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

নতুন জাতি না জাতিদ্রোহিতা

দুনিয়ার সামনে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ আজ ইন্দোনেশিয়ার হাতে নাকি "স্বাধীনতা" তুলে দিয়েছে আর সেই সংযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন ডাঃ সোয়েকার্ণো এবং তার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন মহম্মদ হাত্তা। এঁরা সবাই ইন্দোনেশিয়ার লোক ; কাজেই ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা পেল, নতুন জাতি, নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু থেকে আরম্ভ করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি মায় স্টেটসম্যান পর্য্যন্ত সেই নবজাত রাষ্ট্রকে অভিনন্দনে ডুবিয়ে দিল। কেউ প্রশ্ন করল না, যে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ মাত্র কয়েক মাস আগেই সোয়েকার্ণো, হাত্তাকে গোপনে বন্দী করে রেখেছিল, শুধু তাই নয় মার্কিণের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি প্রান্ত ইন্দোনেশীয় শ্রমজীবি স্বাধীনতাকামী জনতার রক্তে লাল করে দিয়েছিল আজ তারা সত্যিই কি উদার হয়ে পড়ল, না ইন্দোনেশীয়দের জন্যে তাদের প্রাণ কেঁদে উঠল, না এর পেছনে কোন গূঢ় মতলব আছে। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে মূল প্রশ্ন তুলতে হয় আর একটা একটা করে তার জবাব মিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের এই তথাকথিত উদারতা আর হাত্তা—সোয়েকার্ণোর স্বাধীনতা গ্রহণের আসল চেহারা। প্রশ্নগুলি হচ্ছে যে, আজ হঠাৎ ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করছে কেন? দ্বিতীয়তঃ কার হাতেই বা 'স্বাধীনতা'র সনদটি দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ হাত্তা-সোয়েকার্ণো কোন শ্রেণীর প্রতিভূ? সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে—এই 'স্বাধীনতা' জনসাধারণের সত্যিকারের স্বাধীনতা কি না?

প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী-শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছিল বাজার দখলের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্ম্মাণী। তার কাছ থেকে সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নিয়ে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু পুঁজিবাদী জার্ম্মাণীর উপনিবেশ না হলে চলে না তাই সে যুদ্ধের পরেই নিজের লুপ্ত শক্তি, তার কেড়ে নেওয়া বাজার ফিরে পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। এর ফল খুব স্বাভাবিক—বাজারে বাজারে যুদ্ধ হয় উন্মুক্তভাবে লেগে যায়। পুঁজিপতিরা নিজেদের কোলে ঝোল টানার প্রতিযোগিতায় নড়তে গিয়ে দেশের জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ চালায়। এই শোষণের চাপে দুনিয়া জোড়া মানুষের অসন্তোষ প্রসারিত হতে লাগল; এমনি অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়িতে ব্যস্ত তখন মধ্য ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির শোষিত মানুষ একজোট হয়ে ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ লড়াই এর মারফৎ নিজ নিজ রাষ্ট্রে ক্ষমতা অধিকার করে। মহাচীনে এর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই মুক্তি-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মেহনতী মানুষও বসে রইল না, এই সুবর্ণ সুযোগে তারাও মুক্তির লড়ায়ে নেমে গেল।

ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বুঝল যুদ্ধে তারা জিতেছে বটে কিন্তু এ জয় তাদের নয়, তাদের গোলাম শোষিত মানবের। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে পুঁজিবাদের দুর্গে যে ফাটল রুশের বিপ্লব ধরিয়েছিল তা ভীষণ ভাবে বেড়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে অন্তিম অবস্থায় টেনে নিয়ে এসেছে। মধ্য ইউরোপে নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, চীনের মুক্তি ফৌজ দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দোর গোড়ায়, উপনিবেশগুলোতে গণঅভ্যুত্থান—একদিকে যেমন বিশ্ব পুঁজিবাদকে দুর্বল করেছে অন্যদিকে তেমনি তাদের নতুন করে সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা বুঝেছে গোটা পৃথিবী আজ সমাজতন্ত্রের শিবিরে চলে যেতে বসেছে ; এমন সময় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে ঢাকা দিতে না পারলে মুক্তিকামী শ্রমজীবি মানুষের লড়াইকে নিঃশেষ করা অসম্ভব। তাই নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ থাকলেও আজ তারা এক শিবিরের মধ্যে মার্কিণ নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় যেহেতু যতদিন অতিবাহিত হবে পুঁজিবাদ নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে দুর্বল হয়ে যাবে সেই হেতু যত তাড়াতাড়ি আক্রমণাত্মক সংগ্রাম বাধিয়ে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শিবির। তারই প্রস্তুতি হিসেবে একের পর এক সামরিক চুক্তি সাক্ষরিত হচ্ছে, এক এক করে পৃথিবী জুড়ে সামরিক ঘাঁটী গেড়ে চলেছে. বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের একত্রিত করে চলেছে তারা।

বিশ্ব সামাজিক শক্তির দুইটি শিবিরে বিভাগের ফল এবং আগামী যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তুতি হিসেবেই ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে। কেননা যুদ্ধ বাধলে সুদূর আমেরিকা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে ইন্দোনেশিয়ার মেহনতী মানুষের মুক্তির লড়াইকে রুখতে পারা যাবে না—এ শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই পেয়েছে। যুদ্ধ যখন বাধবেই তখন উপনিবেশে এমন বন্ধু তৈরী করতে হবে যারা সাম্রাজ্যবাদের হয়েই সেখানকার প্রগতিশীল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে। এ কাজ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু আবার একদিকে আজ্ঞাবহ পাহারাদার ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ছাড়া আর কে করবে? সুতরাং তাদের হাতে রাজনৈতিক শাসনভার ছেড়ে দিতে হয়। তাতে যখন কোন ক্ষতি নেই বিশেষ করে আগামী যুদ্ধে তাদের বন্ধু হিসেবে পাওয়া যাবে তখন এটা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে লাভের বিষয়। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার বাজার রাখতে হলে ও দেশের পুঁজিবাদের সঙ্গে রফা করতে হবে ; নয়ত যুদ্ধের সময় দেশীয় পুঁজিবাদ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ওপর চাপ দিয়ে ফ্যাসিবাদী সংহত শক্তিকে দুর্বল করে দেবে। সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে অর্থনৈতিক পরাধীনতায় বেঁধে রাখা—এ হল বর্তমানের সাম্রাজ্যনীতি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির। এর নাম বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছে democratic imperialism ফরাসীরা দিয়েছে Humane Colonialism.

হাত্তা সোয়েকার্ণোরা হলেন ইন্দোনেশিয় পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিভূ। তাঁরা জানেন—এখনকার চূড়ান্ত শ্রেণী সমন্বয়ের দিনে দেশীয় দুর্বল পুঁজিবাদকে বাঁচতে

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মধু ও হুল

গঙ্গাস্নান আর গান্ধীটুপি সমগোত্রীয়—তার প্রমাণ আর একদফা মিলেছে দিল্লীতে। শাস্ত্র মতে সব রকম অনাচার, বদাচার, পাপ কাজ করা সত্বেও গঙ্গাস্নান করলে যে গঙ্গাপ্রাপ্তির পর অক্ষয় স্বর্গবাস, এ বিশ্বাস অনেকে রাখেন। তবুও এটা নিছক বিশ্বাস ; হাতেনাতে প্রমাণ কিছু নেই ; কিন্তু গান্ধী-টুপির বেলায় তা নয়, ইহজীবনেই টুপি ধারণের সুফল দেখা দিতে বাধ্য। চুরি চামারী থেকে আরম্ভ করে মদ্যপান আর নারীধর্ষণ পর্য্যন্ত যতগুলো কংগ্রেসী মতে পুরুষোচিত কাজ আছে তার আইনতঃ ফল থেকে মুক্তি পেতে হলে স্রেফ মাথায় একটা গান্ধী টুপি চড়িয়ে দাও, আর দেখতে হবে না ; উকিল মোক্তারের দরকার হবে না ঝামেলা পোয়াতে হবে না, জয় অবশ্যম্ভাবী, একেবারে খাঁটি মহাশক্তি কবচ। কংগ্রেসী পাণ্ডাদের চুরি করলেও সাজা হবে না, এ বিধান সরকারী standing order-এর মত অলঙ্ঘনীয় ; ডাকাতি করার পর গান্ধীটুপি পরে কোন এক কংগ্রেসী মন্ত্রীর শরণ নেওয়ায় বেকসুর খালাস মিলেছে এ সবই এই পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী শাসনকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। নারীধর্ষণক্ষেত্রে গান্ধীটুপির শক্তি যুক্তপ্রদেশ প্রথম দেখালেও, পশ্চিম বাংলা নিজ প্রদেশের record সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সহসভাপতিকে এই কাজে পুনর্নিয়োগ করেছে এবং অধীর আগ্রহে টুপি ধারণের ফল—সসম্মানে মুক্তি প্রত্যাশা করছে। বাকি ছিল মদ্য পান ; তাও দিল্লীতে মিলল। জনৈক প্রধান কংগ্রেসী M C A (Member Constituent Assembly এরচেয়ে বোধ হয় Member Criminals' Association বললে সঙ্গত হয়) তাঁর এক আত্মীয়কে বিদেশে পড়বার সরকারী বৃত্তিটার জন্য কর্মকর্তা এক I C S অফিসারের কাছে তদ্বির করতে গেলে তিনি অতিথিকে দামী 'স্কচ' মদ পানের জন্য দেন। M C A-টি বলেন গান্ধী টুপি মাথায় রেখে তিনি মদ স্পর্শ করবেন না—এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন বহু বছর আগে। তারপর তিনি টুপিটি খুলে স্কচ ব্রাণ্ডটি পান করেন এবং টুপিটি আবার মাথায় চাপান। সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান জনিত দোষ খণ্ডিত ত হলই উপরন্তু আত্মীয়টির বৃত্তি পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। এরপর তান্ত্রিক মহাকালী, মহাশক্তি, বগলা প্রভৃতি বিখ্যাত কবচ প্রস্তুতকারকদের সাহস হবে না গান্ধীটুপির শক্তি challange করতে।

* * *

পরশুরাম বিরচিত 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' বই দুটিতে একটা চরিত্র আছে যার অভ্যাস হল ইয়ারী মজলিসে কথায় কথায় স্ত্রী কথা টানা। অন্যেরা অবশ্য অন্যের স্ত্রী প্রশস্তি সহ্য করতে নারাজ বলে তাকে বার বার থামিয়েই দিয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেণ্টে যে রকম ভাবে দুই মহারথী নিজেদের স্ত্রী প্রশস্তিতে মেতে উঠেছিলেন তাতে অন্য সভ্যরা নির্ব্বিবাদে কি করে শুনে গেলেন তা ভাববার কথা, তাঁদেরও যখন স্ত্রী আছে তখন তাঁরাই বা কেন হক দাবী নিজেদের স্ত্রী-প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হবেন! তবে সম্ভবতঃ শাসনতন্ত্র গৃহিত হবার সময় সভ্যরা যেমন নিশ্চিন্তে এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড ঘরে আরামে নিদ্রা দিতেন সভাপতির ঘণ্টাধ্বনিতে তাঁদের নাসিকা গর্জন প্রশমিত হত না এবারও বোধ হয় সেই তুরিয় অবস্থায় সভ্যরা ছিলেন নচেৎ তাঁরাও এই মনোরোচক আলোচনায় নিশ্চয় যোগ দিতেন। মহারথী দুজন হলেন কংগ্রেসের দুই সভাপতি—সীতারামিয়া ও কৃপালনী। সীতারামিয়া তবু সংক্ষেপে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী খুব ভাল মানুষ। কৃপালনীজী কিন্তু আরও বহু ধাপ এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তাঁর কি কি করে দেন—তাঁর জামা কাপড় কেচে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিরকম নজর রাখেন তার একবিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কোথায় গেল হিন্দু কোড বিল আর কোথায় গেল তার পক্ষে যুক্তি। রইল শুধু স্ত্রী। সীতারামিয়াজী ও কৃপালনীজীর বয়স আমরা জানি ; দয়া করে যদি তাঁদের সহধর্মিণীদের বয়সটা তাঁরা বক্তৃতার মারফৎ জানাতেন তাহলে আমাদের সুবিধা হত তাঁদের স্ত্রী প্রশস্তির কারণটা বিশ্লেষণ করতে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—কথাটা খাটে কিনা তা তখনই বলা সম্ভব হত আগে নয়।

সকলের জন্য শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা চাই

(প্রাভ্‌দার ৩০শে নভেম্বরের সম্পাদকীয়ঃ—কমিনফর্মের বৈঠক)

সাম্প্রতিক কমিনফর্ম ব্যুরোর বৈঠকে গৃহীত যে সমস্ত প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক পার্টি গুলির পক্ষে, গোটা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের জীবন মরণের প্রশ্নের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকে সকলের সম্মতিতে তিনটি বিষয়ে প্রস্তাবনেওয়া হয়েছে ঃ—(১) শান্তি রক্ষা এবং যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে লড়াই। (২) শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এবং কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ঐক্য। (৩) খুনে ও গুপ্তচরদের দল যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি। এবং সমাজতন্ত্রের শিবিরের সেই পরিবর্তন গুলো হয়েছে অনুকূল। গৃহীত প্রস্তাব গুলিতে দেখান হয়েছে কিভাবে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের হামলা দিন দিন বেড়ে চলেছে, আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবির বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সোবিয়েৎ নেতৃত্বে কিভাবে শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের শক্তি বেড়ে চলেছে।

সোবিয়েতের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি সোবিয়েত বাসীর জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি, নব গণতন্ত্রের সমাজতন্ত্রের শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি, ধনিক দেশগুলোতে ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক সংকট, পুঁজিবাদের সমস্ত রকমের অন্তঃসংঘাতের এবং সাধারণ সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি এই গুলোই হোল সাম্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষয়ের প্রমান।

পুঁজিবাদের সংঘাত যতই বাড়ছে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবির যতই বলশালী হচ্ছে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তাদের আক্রোশ ততই ফুলে ফুলে উঠছে এবং ততই তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি বেড়ে চলছে। তারা একচেটিয়া যে, মার্কিন ও ব্রিটিশ নেতৃত্বে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে তার সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করা বা ছোট করে দেখা মারাত্মক ভুল হবে এবং শান্তির লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

আজকে গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে জলন্ত সমস্যা হোল শান্তিরক্ষা ও রণদানবদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান এই সমস্যা আজ শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবি ও মধ্যবিত্তের মনকে তোলপাড় করছে। কমিনফর্ম তাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে যুদ্ধের আংশকার উৎস কোথায় কোথায়

ইঙ্গমার্কিন ফ্যাসিবাদী চক্র সারা বিশ্বের প্রগতিশীল জনতার ওপর যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে নিজেদের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে মুনাফা লোটবার ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, তাকে সফলভাবে প্রতিরোধের একমাত্র উপায় প্রত্যেক দেশে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধবিরোধী গণমোর্চা গঠন করা। এই গণমোর্চাকে হতে হবে প্রকৃত গণমোর্চা, দলীয় ফ্রন্ট নয়; কেন না যে কোন দল, তা সে যতই শক্তিশালী হক না কেন, তার একার পক্ষে বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার এই জঘন্য চক্রান্তকে ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। কমিনফর্মের প্রস্তাবে তাই প্রত্যেক দেশের কম্যুনিষ্টদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তাঁরা যেন নিজ নিজ দেশে ধর্ম্ম, রাজনীতি, দল, ট্রেড ইউনিয়ন নির্বিশেষে প্রত্যেক শান্তিকামীকে ঐক্যবদ্ধ করেন এই যুদ্ধ বিরোধী শান্তি মোর্চায়। এ কথা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার বহু দিন আগে হতে বলে আসছে; কমিনফর্মের সাম্প্রতিক প্রস্তাব আমাদের বিচার বিশ্লেষণের নির্ভুলতার প্রমান দিল আর একবার।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি আমাদের এ কথায় কান না দিয়ে কমিনফর্মের প্রস্তাবের বিরোধীতাই করছেন। তাঁদের কমরেডদের কাছে আমাদের অনুরোধ "তাঁরা প্রাভদার" সম্পাদকীয় এই প্রবন্ধটির বক্তব্যের মাপকাঠিতে বিচার করে দেখুন, তাঁদের দলের নীতি, তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনের চরিত্র; দলীয় গোঁড়ামীর ঊর্দ্ধে উঠে বিচার করে দেখুন শান্তি মোর্চা কি তাঁদের দলীয় ফ্রন্টে পরিণত হয় নি? তাঁরা কি কোনদিন চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলিকে শান্তি শিবিরে টেনে আনতে? কম্যুনিষ্ট বলে দাবী করলে এ দায়িত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

কমিনফর্ম যেখানে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতৃত্বকে—তার তলার অংশ, তার আসল শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে উপদেশ দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির সহিত ঐক্যবদ্ধ হতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, বৃহত্তম সাধারণ কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে সক্রিয় আন্দোলনের মারফৎ তলা থেকে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলতে বলেছেন, বর্ত্তমান সময়কে mobilisation ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার সময় বলে বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি গোটা সোস্যাল ডিমোক্রেটিক শিবিরকে—তার মধ্যের কম্যুনিষ্ট ঘেঁষা বামপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতৃত্ব এবং সাধারণ শক্তি সমেত—এক কথায় দালাল বলে অভিহিত করে অপাঙক্তেয় করে রাখতে গিয়ে নিজেরাই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় যে তাঁরা যে বিশ্বাসী নন তার হাজার রকম প্রমাণ দিয়ে চলেছেন এবং বর্ত্তমান সময়কে mature for revolution' বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত এবং 'যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে যুদ্ধ রোধ করার সময়' বলে বিশ্লেষণ করে প্রস্তুতির আগেই ফ্যাসিবাদের সহিত চূড়ান্ত সংগ্রামে নেমে পড়েছেন।

ইতালীর কম্যুনিষ্ট পার্টির মত বিরাট শক্তিশালী দলের আপত্তি নেই বামপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে, ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যুদ্ধ বিরোধী পাদরীদেরও স্থান হয়েছে, ফ্রান্সে যেখানে পাঁচ জন সৈনিকের মধ্যে একজন কম্যুনিষ্ট সেখানেও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই এর দিন আসে নি বলে ভাবা হয় কিন্তু এঁদের সহস্রাংশের একাংশ শক্তিশালী না হয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ঐক্যবদ্ধতায় রাজী নন। শুধু রাজী নন তাই নয় যাঁরা ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধ বিরোধী শান্তি মোর্চা গড়ায় বিশ্বাসী তাঁদের দ্বারা আহুত শান্তি সভাকে গুণ্ডামী করে ভেঙ্গে দিতে চান। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দ্বারা ১১ই ডিসম্বর তারিখে কলিকাতার হাজরা পার্কে আহুত সভায় তাঁদের ব্যবহার এই কথার প্রমান। আমরা এখনও কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বুঝতে অনুরোধ করি, শান্তি মোর্চা দলীয় মোর্চা নয় এবং এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রমিক দলগুলির সহিত জরুরী গণঐক্য ফ্রন্ট গড়ে তুলতে আহ্বান জানাই। —সম্পাদক, গণদাবী।

আজকের দিনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হোল মার্কিনি ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশক্তিগুলো নতুন যুদ্ধের তোড় জোড় করছে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বীভৎস আক্রমণ চালাচ্ছে, বহু দেশের জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। এ হেন সময়ে কমিনফর্মের বৈঠক হয়েছে।

মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিন-স্তালিনবাদের ভিত্তিতে কমিনফর্ম বৈঠকে দেখান হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শক্তিগুলির আপেক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে কি কি পরিবর্ত্তন হয়েছে যার ফলে শান্তি, গণতন্ত্র দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বলাভ ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতি, চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিজয়লাভ, জার্ম্মান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিশ্বজোড়া শান্তি সংগ্রামের প্রসার, দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির শক্তিবৃদ্ধি, এই সমস্ত ব্যাপার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতন্ত্রী শিবিরের অগ্রগতিরই প্রমাণ।

১৯৪৭ সালের কমিনফর্মের যে বৈঠক হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদ আরো দুর্বল হয়েছে। তারপরে দিনে দিনে এই দুর্ব্বলতা বেড়েই চলেছে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে ঠেকা দিয়ে খাড়া করে রাখতে চায়। ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের গোটা কর্ম্মপন্থাই হোল যুদ্ধমুখী। কালকের ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের পদাংক অনুসরণ করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সাদিক দিয়ে যুদ্ধের তোড় জোড় চালাচ্ছে। Strategic কায়দা, রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক প্রসার, বিভিন্ন জাতিকে পদানত করা জনগণকে আদর্শবাদের আফিং খাইয়ে অবশ করা এবং প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এই সব হোল তাদের পথ।

কমিনফর্মের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা যখন বেড়ে চলেছে, তখন কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক পার্টি গুলির ওপর এক বিরাট ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। যুদ্ধকামী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শান্তিকামী শক্তিগুলিকে সংগঠিত করে দানা

(শেষাংশ ৫ম পাতায়)

ডাচ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে ইন্দোনেশিয়াকে বলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলে শক্তিশালী লগ্নি পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করে বাঁচতে হবে। তা না হলে শোষিত জনগণ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করবে। সুতরাং তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য। তাই দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া "স্বাধীনতা" পাওয়ার পরও America Standard Oil, Socony vocuum oil, General Motors, Ford, Good Year Rubber, Unilever and Colgate-Palmolive Peet, Ever Ready, National Carbon, British American Tobacco Co প্রভৃতি কোম্পানীরা যে কোটি কোটি ডলার মুনাফা লুটে নিয়ে যেত তাতে কোনরকম হাত দেওয়া হবে না বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে। ভারতবর্ষ যেমন পাউণ্ড-ষ্টার্লিংএর অধীনতা পাশে বাঁধা থাকার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার, বর্ম্মা হতে যেমন এক তেল আর উলফর্ম্ম খনি হতে ১০ কোটি টাকা মুনাফা বছরে লুটে নিয়ে যায় বৃটিশ পুঁজিপতির দল যার ফলে ভারতীয় ও বর্মীয় জনতা আজও দারিদ্র্যে নিপীড়িত, ইন্দোনেশিয়ার দেশীয় পুঁজিবাদ আরও দুর্বল হওয়ায় সেখানকার জনতার দুর্দ্দশা ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার জনতার চেয়ে আরও চরম হবে।

তাহলে পরিষ্কার হল এ স্বাধীনতা ইন্দোনেশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবার পর এবারে তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় দেশের জনসাধারণকে আগের চেয়ে আরও তীব্রভাবে শাসন করে ও শোষণ চালিয়ে নিজেকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। এর ফলে জনতার ওপর শোষণ, বর্ব্বর আক্রমণ, নিষ্পেষণ বাড়বে বই কমবে না। তবে একথাও ঠিক এ অবস্থার শেষ হতে দেরীও হবে না। দিকে দিকে তার প্রমাণ মিলছে। হাতুড়ী আর কাস্তের আঘাতে পুঁজিবাদের ভিৎ চূর্ণ হচ্ছে; এশিয়ার মহাচীনে সম্পূর্ণ হল বলে, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়ায় তাও হবে। তারই প্রস্তুতি গড়ে তুলছে শোষিত মানুষ। যেদিন তা হবে, সেদিন আসবে জনতার মুক্তি—সেইদিন নেহেরু, প্যাটেল, স্যু, ম্যাকখি, হাতা সোয়েকার্ণোর দশা হবে চিয়াংএর মত। এখনকার ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব জনতা তখনই নেবে।

কংগ্রেসী সরকারের লেবার কমিশনারের মালিক তোষণ

মালিককে কিছু না বলিয়া মজুরদের উপর জুলুম

কিছুদিন পূর্ব্বে লিলুয়া আর. বি. এস্ জৈন কোম্পানীর শ্রমিকরা কমরেড নরসিং সিংএর নেতৃত্বে মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট করে। ধর্মঘট তিনমাস ধরিয়া চলিবার পরও শ্রমিকদের মনোবল কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া মালিকপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকারের লেবার কমিশনারের শরণ লয়। কমিশনার সাহেব ঘটনাস্থলে গিয়া নানা মিথ্যা ধাপ্পা দিয়া শ্রমিকদিগকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দেন এবং বলেন ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলে মালিক পক্ষকে তিনি শ্রমিকদের দাবী মানিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। কিন্তু তাহার পর চারি পাঁচ মাস অতীত হইতে চলিল অথচ আজ পর্য্যন্ত লেবার কমিশনার শ্রমিকের দাবীর কিছুই করেন নাই। বার বার তাগাদা দিয়াও কোন ফল না পাওয়ায় শ্রমিকরা যখন শেষ বারের মত তাঁহাকে চাপ দেয় তখন তিনি এই অজুহাত দেখান যে, মালিককে ডাকিয়া কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

মজুর ভাইদের বোঝা দরকার কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী সরকার। মুখে তাহারা বড় বড় শ্রমিক দরদী কথা বলিলেও আসলে তাহারা মালিকেরই স্বার্থ রক্ষা করে। তাহার যত কিছু আইন কানুন আছে, আদালত অফিসার আছে, সব কিছুরই উদ্দেশ্য হইতেছে মালিক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ বাঁচাইয়া রাখা। তাই প্রথম প্রথম তাহারা ধাপ্পা দিয়া মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কাজ হাঁসিল করিতে চেষ্টা করে; পরে শ্রমিকরা তাহাদের ধাপ্পা ধরিয়া ফেলিয়া মিষ্ট কথায় না ভুলিলে চলে দুখা শ্রমিকদের উপর অমানুষিক জুলুম—লাঠি গ্যাস ও গুলির প্রয়োগ। এই অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া দাবী আদায় করিতে হইলে চাই, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। তাহার জন্য নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করিতে হইবে ইস্পাতের মত; নিজেদের জঙ্গী মনোভাবকে আরও জঙ্গী ও কেন্দ্রীভূত করিতে করিয়া ধর্মঘট করিতে হইবে।

হাওড়ায় কৃষকদের উপর নির্য্যাতন

মারধোর, গ্রেপ্তার ও জোর করিয়া কংগ্রেসের সভ্য করার কাজে পুলিশ নিয়োগ

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় হাওড়া জিলার বড়মহরা, কোটালপাড়া, কুরীট প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের ক্ষেতমজুরা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন করে। ফলে ঐ অঞ্চলের জোতদাররা জোর করিয়া ক্ষেতমজুরদের দিয়া কাজ করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে পুলিশের সাহায্য লয়। ৩০।৪০ জন সশস্ত্র পুলিশসহ ৪ জন উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার উক্ত অঞ্চলে গিয়া বড়মহরা, কোটালপাড়া ও আশেপাশের গ্রামের চাষী, ক্ষেতমজুরদের এমন কি নিম্ন মধ্যবিত্তদের উপর হামলা চালায়। বহু বাড়ী তল্লাসী করিয়াও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া না যাইলেও ২৫।৩০ জন ক্ষেত মজুর ও বেশ কয়েকজন ছাত্রকে থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের গালিগালাজ মারধোর করে। অবশেষে জোর করিয়া তাহাদের কংগ্রেসের অঙ্গীকারপত্রে সহি করাইয়া লয় এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয় যে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে ও কোনরূপ আন্দোলন করিলে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে না। ইহাতেও জোতদারেরা সন্তুষ্ট না হইলে তাহাদের চাপে নাকি কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ষ্টেট বাস কর্ম্মচারীদের উপর নয়া জুলুম

৪০৲ টাকার কম টিকিট বিক্রয় হইলে বরখাস্ত

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ষ্টেট বাস কণ্ডাকটার প্রতিদিন ৪০৲ টাকায় কম টিকিট বিক্রয় করিবে তাহাদিগকে ছাঁড়াই করা হইবে। অদ্ভুত বিচার। যদি সরকারী বাসে প্যাসেঞ্জার না ওঠে, যদি অফিসের সময় ২৫।৩০ মিনিট অপেক্ষা করিয়াও সরকারী বাস না পাওয়ায় বেসরকারী বাসে প্যাসেঞ্জার চলিয়া যাওয়ায় সরকারী বাসে কম টিকিট বিক্রয় হয় তবুও বেচারী কণ্ডাকটারের চাকুরী যাইবে যেহেতু সে ৪০৲ টাকার কম টিকিট বিক্রয় করিয়াছে। সরকারী বাজেটে দেখা গিয়াছিল ষ্টেট বাসে সরকারের লাভ ভাল হয়—নেহাৎ খাতিরের লোকদের মোটা মোটা বেতন এবং জানা শোনা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হয় বলিয়া যা ঘাটতি। এই বাজে খরচগুলি কি কমান সম্ভব নয়? না তাহাতে মন্ত্রীত্ব যাইবার ভয় আছে বলিয়া অসম্ভব? কণ্ডাকটাররা যদি টিকিট বিক্রয় না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তবু এই কথা বলিতে পারে (যদিও কর্মচারীদের উপর যে অত্যাচার চালান হইতেছে তাহাতে কাজে উৎসাহ বোধ করা ত দূরের কথা আত্ম সম্মান বাজায় রাখাই অসম্ভব হইয়া পড়ায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক)। আর কণ্ডাকটাররা ফাঁকি দিতেছে কি না তাহা inspect করার জন্য অফিসারেরও অভাব নাই যখন, তখন কম টিকিট বিক্রয় হওয়ার জন্য কণ্ডাকটারদের কোন রককেই দোষী বলা যায় না। ৪০৲ টাকার কম টিকিট বিক্রয় করিলে যদি গরীব কণ্ডাকটারদের চাকুরী যায় তাহা হইলে কোটি কোটি টাকা "অধিক খাদ্য শস্য ফলাও" আন্দোলনে খরচ করিয়াও ফসল যখন ক্রমশই কমিতেছে তখন কেন মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষি বিভাগের বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তাদের চাকুরী যাইবে না?

ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী ভাইদের এ ধরণের অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিতে হইলে নিজেদের ইউনিয়নকে আরও শক্তিশালী ও জঙ্গী করিতে হইবে। সংহতি ও শক্তির জোরেই পুঁজিবাদী সরকারের জুলুমকে ব্যর্থ করা একমাত্র সম্ভব।

প্রাপ্তি স্বীকার

বিশ্বনাথ বর্ম্মন সম্পাদিত "অগ্রগামী" ১ম বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা আমরা পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। হুগলী জেলার জনতার কথা নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা সহযোগীকে অভিনন্দন জানাই।

সম্পাদক, গণদাবী

শ্রমিক-শ্রেণীর দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে

(৩য় পৃষ্ঠায় পর)

বাধানোর জন্য স্থায়ী শান্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়া, এই হোল আজকের দিনে কম্যুনিষ্ট পার্টি গুলির এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই অন্যতম কর্ত্তব্য।

কমিনফর্ম বৈঠকের প্রস্তাবগুলিতে রণদানবদের বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে তার বাস্তব কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। জনগণকে সমবেত করে শান্তির জন্য সক্রিয় আন্দোলন চালানই হল যুদ্ধের চক্রান্ত ব্যর্থ করার শ্রেষ্ঠ পথ। জনগণ যদি সজাগ থাকে, সাহসে ভর করে যদি তারা শান্তিকে আগলে রাখে, যুদ্ধকামীদের প্রতি পদে পদে তারা মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলে আসল মতলব প্রকাশ করে দেয় তাহলে যুদ্ধের পথে এক দুর্লংঘ বাধার প্রাচীর গড়ে উঠবে। সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টি মাত্রেরই কর্ত্তব্য রাজনীতি, দল, ট্রেড ইউনিয়ন ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক শান্তিকামী-কে ঐক্যবদ্ধ করা। যারা শান্তিকে অমূল্য মনে করে যারা আর একটি ভয়াবহ নরহত্যার নরক কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চায় না, যারা মুষ্টিমেয় ইঙ্গ-মার্কিন ধনিকের উচ্চাশার আগুনে নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারদের আত্মাহুতি দিতে চায় না তাদের সবাইকে দেশ-জোড়া শান্তিরক্ষার জাতীয় বেদীতে সমবেত হতে হবে।

এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিশালী শান্তি আন্দোলনই হবে জনগণের শান্তি কামনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যা রণদানবদের খেদিয়ে দিতে পারবে। দেশজোড়া এমন এক সক্রিয় সংগ্রামী শান্তি আন্দোলনের অগ্রগতি, যা যুদ্ধের পথে শক্তিশালী বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে সেই আন্দোলনকে গড়ে তোলাই হোল কম্যুনিষ্ট পার্টি গুলির যুগোচিত কর্ত্তব্য।

শ্রমিক শ্রেণীর দানাদার ঐক্যই হোল শান্তি গণতন্ত্র ও মেহনতী জনগণের স্বার্থ-রক্ষার এবং জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে বাধাদান করার প্রধান সর্ত্ত।

প্রতিক্রিয়াশক্তির যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর, জীবনযাত্রার ওপর প্রত্যেকটি ধনিকরাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়ার নির্ম্মম আক্রমণ। নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধ করার জন্য তারা শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ভাঙ্গবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বুর্জোয়া শ্রেণী এই ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের হাতে। বেভিন ও এটলী ব্লুম গাইমোলেৎ, সুমাখার ও রেণার, স্পাক ও সারাগাৎ, ডিকিন গ্রীণ ও বেরীরমত প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়নের বড়কর্ত্তা এরা সবাই মিলে শ্রমিক শিবিরে ফাটল ধরাবার জন্য না করছে এমন কাজ নেই। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ লাগাবার চেষ্টা করছে, গণতন্ত্রের ওপর হামলা চালাচ্ছে, শ্রমিকের রুটি কেড়ে নিচ্ছে চাকরী কেড়ে নিচ্ছে, তারওপর সামরিক ব্যয়ের ভারী বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে প্রচার চালাচ্ছে যে কমুনিষ্টরা শান্তির অকৃত্রিক সাধক, গণতন্ত্রের ও শ্রমিক স্বার্থের সত্যিকারের রক্ষক নয়। শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাদীদের যত-রাজ্যের চক্রান্ত গুলোকে আদর্শবাদী পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখার কাজ হয়েছে এই দক্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রীদের। আজ তারা শুধু জাতীয় বুর্জোয়ার কেন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদেরও দালাল বটে।

সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের স্বার্থে প্রতি পদে পদে দক্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রীদের মুখোস খুলে দিতে হবে তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ক্যাথলিক ট্রেডইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে কঠোর ধৈর্য্যধরে অক্লান্ত চেষ্টায় কাজ করে যেতে হবে যাতে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের বিশ্বাস ঘাতকতাকে তারা চিনতে পারে—এবং তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ও শান্তিরক্ষার লড়াইতে নেমে আসে।

ধর্ম্ম ট্রেডইউনিয়ন ও পার্টি নির্ব্বিশেষে সমস্ত শ্রমিককে সংহত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হোল নীচের দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের এতখানি প্রয়োজন বোধ হয় এর আগে কোনদিন ছিল না। সেই জন্যই কম্যুনিষ্টরা অদম্য উৎসাহ নিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে।

কমিনফর্ম্মের বৈঠকে যুগোশ্লোভ কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছিল যে টিটো র‍্যাংকোভিক চক্র যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় স্বার্থ ইঙ্গ মার্কিণদের হাতে বিকিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ থেকে ফ্যাসিবাদে গিয়ে পৌছেছে। ১৯৪৮ সালের কমিনফর্ম্ম বৈঠকে টিটো-চক্রের আসলরূপপ্রকাশ করে দেওয়ার পর থেকে এই চক্র দেশদ্রোহিতা এবং প্রতিবিপ্লবের পাঁকে দিন দিন ডুবে যাচ্ছে। যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং যুগোশ্লাভ সরকার সমাজ-তন্ত্র ও গণতন্ত্রের শিবিরের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে, নব গণতন্ত্রগুলি এবং সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বেলগ্রেডের এই খুনে আর গুপ্তচরের দল সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে চাকর বনে গিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশেষ করে রায়েক এবং ব্রাংকভের একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে ব্রিটিশ ও মার্কিণ প্রভুদের হুকুমে টিটোচক্র পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশক্তির সেবা করতে লেগেছে। বহুকাল ধরে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচরের কাজ করে আসছে। এরা ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের প্রতীক, যুগোশ্লাভ জনগণের কামনার প্রতীক এরা নয়। এরা দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে এরা শ্রমিক শ্রেণীর যুগোশ্লাভ জনগণের শত্রু প্রতিদিন এদের বন্দাগিরির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আজ যখন শান্তির প্রহরী সোবিয়েৎ ইউনিয়নের চারিদিকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সমবেত হচ্ছে, বিশ্বসভার অধিবেশনে তখন যুগোশ্লাভ দেশদ্রোহীরা সাম্রাজ্যবাদ ও রণদানবদের নীতিকে সমর্থন করছে। তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশিত নানা চুক্তিচক্রান্ত করছে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তে অস্ত্র আস্ফালন করছে নব গণতন্ত্রগুলোতে গুপ্তচর পাঠাচ্ছে। রণদানবদের হুকুম তামিল করছে তারা। যুগোশ্লাভিয়ায় টিটোচক্র নব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা অপহরণ করে বসে আছে। সেখানে তারা এক ফ্যাসিষ্ট পুলিশী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। যারা সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট যারা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার পূজারী যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে টিটোচক্রের মুগুর আর খাঁড়া আঘাত করছে তাদের মাথায়। তাদের হাজারে হাজারে বন্দীশালায় পাঠান হয়েছে এবং তাদের বহুলোককে হত্যা করা হয়েছে।

কমিনফর্মের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে আজকে যুগোশ্লাভিয়ায় যে কম্যুনিষ্ট পার্টি রয়েছে তা দেশের শত্রুদের কবলিত, খুনে আর গুপ্তচর দিয়ে গড়া। সেই কম্যুনিষ্ট পার্টি টিটো কার্দেলি র‍্যাংকোভিক দিলাস-চক্রের গুপ্তচরবৃত্তি চালাবার যন্ত্র বিশেষ। সুতরাং যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি নামে অভিহিত হবার অধিকার হারিয়েছে।

কিন্তু এই চক্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন যুগোশ্লাভিয়ায় ক্রমশঃ দানা বাঁধছে। সমাজতন্ত্রকামী ন্যায়নিষ্ঠ মানুষেরা সমস্ত রকমের নির্য্যাতনকে তুচ্ছ করে যুগোশ্লোভিয়াকে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কমিনফর্ম্ম বৈঠকের প্রস্তাবগুলি তাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। কমিনফর্ম্মের মতে, "খুনে আর গুপ্তচরদের দঙ্গল টিটোচক্রের বিরুদ্ধে, আন্দোলন সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির ও শ্রমিক পার্টির আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্য।"

কমিনফর্ম্মের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদ সম্মত সাংগঠনিক, আদর্শগত এবং রাজনৈতিক সংহতিই হোল শান্তি, গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার একমাত্র উপায়। সমস্ত রকমের সুবিধাবাদ, বিভেদনীতি, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, পার্টির মধ্যে শত্রুর চরদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই বর্ত্তমান পরিস্থিতির যুগোচিত কর্ত্তব্য।

গত দুই বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে ১৯৪৭ সালে কতকগুলি কম্যুনিষ্ট পার্টির বৈঠক, বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এবং কাজের সমন্বয়ের স্বার্থে কমিনফর্ম প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সেই সিদ্ধান্ত অসাধারণ সহায় হতে পেরেছে। কমিনফর্মের প্রথম বৈঠকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির অবস্থানের বর্ণনা করা হয় এবং 'সাম্রাজ্যবাদী" ও "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী" এই দুটি শিবিরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা হয়। সেই সম্মেলনেই আর একটি যুদ্ধের আশংকা এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা তাদের আবার কবলিত হবার সম্ভাবনা পৃথিবীর

(শেষাংশ ৬ পাতায়)

কাপড়ের রাজাদের কোটি কোটি টাকা লাভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পড়ে ৫ গজের মত সারা বছরে। নেতাদের রামরাজ্যমানের রাজত্বে জনসাধারণের এর চেয়ে বেশী কাপড় চোপড় পরা শোভন হয় বেয়াদপি। মন্ত্রীরা সব সাধু পুরুষ কিনা, তাই গোটা জাতটাকেই কৌপিন পরা শিক্ষা দিচ্ছেন। এর পরও প্রশংসা করতে হবে সরকারী বস্ত্র নীতিকে, কেননা তা না করলে দেশদ্রোহী আখ্যা নিয়ে ঠাণ্ডা গারদে স্থান নিতে হবে পরম কারুণিক সরকার বাহাদুরের কৃপায়। সত্য গান্ধীয় অহিংস নীতি, সত্য তাঁর দ্বারা প্রচারিত "toleration of others' faith"; সত্যকারভাবে গণতন্ত্র আর সত্য নেতাদের কৃষক-প্রজা-মজদুর রাজের নমুনা।

এইত গেল জনতার কথা; তারপর তার এক বিশেষ অংশ যারা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—সেই শ্রমিক শ্রেণীর কথা বিচার করে দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে উৎপাদন কম করিয়ে বেশী লাভ করার উদ্দেশ্যে মালিক পক্ষ নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই করে চলেছে। একা বোম্বাই প্রদেশে ৫৫ হাজার সূতাকল শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে ১ লাখের মত হবে। এই ত গেল শ্রমিকদের একাংশের কথা—অন্য অংশ যারা এখনও কাজ করে চলেছে তাদেরও অবস্থা তথৈবচ। কাজ করে কিন্তু খেতে পায় না। সূতাকলগুলিতে লাভ যত বাড়ছে শ্রমিকের আয় তত কমছে। Eastern Economist বিড়লার কাগজ; সে শ্রমিকদের হয়ে ওকালতি করবে না নিশ্চয়। দেখা যাক সে কি বলে।

বছর	জিনিষপত্রের মূল্য সূচক	সূতাকল শ্রমিকের প্রকৃত আয় ১৯৩৯ সালের তুলনায়
১৯৩৯	১০০	৩১০.২
১৯৪১	১১৫	২৯৮.৬
১৯৪৫	২৫৩	২৮৫.৭
১৯৪৭	২৯১	২২০

(ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট ১৯৪৮, ৩১শে ডেসেম্বর সংখ্যা)

১৯৪৭ সালের পর জীবন ধারণের খরচ গিয়াছে ৩ গুণ বেড়ে এখনত প্রায় ৪০০র কাছে এসেছে অর্থাৎ যুদ্ধের আগের ৪ গুণের মত অথচ আয় বাড়েনি। মজুরী যা পায় তা দেখলে অবাক হতে হয়।

প্রদেশ	মূল বেতন	মাগগী ভাতা
মাদ্রাজ	১৬৲ টাকা	প্রতি পয়েন্টের জন্য ৵১০ থেকে ।/০
পশ্চিম বাংলা	৩০৲	পুরুষদের লোক ৩০৲ মেয়েদের ২২॥০
যুক্ত প্রদেশ	৩০৲	প্রতি পয়েন্টের জন্য ৵০ হতে ৶০
বোম্বাই প্রদেশ	২২॥০ হতে ৩০৲	

পশ্চিম বংলার কথাই ধরা যাক। এখানে একজন সূতাকল পুরুষ শ্রমিক পায় ৬০৲ টাকা। আগে সে এর চেয়ে বেশী রোজগার করত, ৭২॥০ টাকা মত। জিনিষপত্রের যা দাম তাতে কোন পরিবারেরই ৬০৲ টাকায় চলে না। তাই শ্রমিক পরিবারের শতকরা ৮০টির বেশী ঋণগ্রস্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে সূতাকলগুলিতে লাভ হয় না বলে মজুরী বেশী দেওয়া যায় না। অবশ্য সূতাকলগুলির সমাজীকরণ হলে যে, মজুরের অনেক বেশী এবং উপযুক্ত মজুরী দেওয়া যায় তাও সত্য। কিন্তু এ সব ছেড়ে দিলেও সূতাকলগুলিতে লাভ যা হচ্ছে তা প্রচণ্ড। তাতে শ্রমিকদের অনেক বেশী মজুরী দেওয়া যায়। চোরাবাজারের ব্যবসায়ে লাভ, আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য অলিখিত লাভ প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলেও সরকারের কাছে যে হিসাবে দাখিল করা হয় তাতেই কি লাভ দেখান হয়েছে তা পরীক্ষা করলেই এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে। পাশের তালিকায় দ্রষ্টব্য।

এ ধরণের অবস্থা সব মিলেই। লাভ যা দেখান হয়েছে তা কিন্তু নীট লাভ। অর্থাৎ মিলের Reserve fundয়ে লাখ লাখ টাকা, ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশন বাবদ টাকা যেটা মোট লাভের শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের মত, আয়কর বাবদ প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তাই। তাহলে আসল ব্যাপারটা কি তা ভাবুন। একটা মিলের ব্যাপার উদাহরণ দেওয়া যাক। স্বদেশী কটন মিল—ম্যানেজিং এজেন্ট তার জয়পুরিয়া ব্রাদার্স। তার প্রদত্ত মূলধন হচ্ছে ৭৫ লাখ টাকা। Reserve fundয়ে জমা আছে ২ কোটি ১৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। ১৯৪০ হতে ১৯৪৮ সাল, এই আট বছরে নীট লাভ হল ২ কোটি ২০ লাখ ৮১ হাজার ৪৮৯ টাকা। এই ক বছরে সরকারকে আয় কর দিয়েছে ৫ কোটি ৬২ লাখ ৯ হাজার ৫৫ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশন এই সব মোট টাকার শতকরা ২০ ভাগের মত, একেবারে ঠিক না বলতে পারলেও

মিলের নাম	প্রদত্ত মূলধন	নীট লাভ (টাকা) ১৯৪১	১৯৪৩	১৯৪৫	১৯৪৭	১৯৪৮
মাদুরা মিল	১, ৭৫ লাখ	২২,৮৩,২০০	১,০০৬৮,০২৭	৫১,৮৩,৮১৮	৫৬,৮৭,৭০০	৮০,৩০,৬৭৯
আমেদাবাদ এডভান্স	২০ লাখ	×	২৫,৪৬,৩৪৩	২০,০৯,৩৬৩	১৩৮০৭০৭	২০০৫৬৮৮
আমেদাবাদ কেলিঃ প্রিণ্টিং	৫৮ লাখ ৩২ হাজার	৮,৬৯,৯৬৩	১,৭৭,০২,৭৬৮	৭৬,৮৬,২১০	৪৭৪৭৪৯০	×
অরুণা মিল	১০ লাখ	×	৭৩২৬০৪০	২৩৩৭৫৫২	১৮০৪৪৫৬	×
দিল্লী ক্লথ	৮৪ লাখ	৬৮,৯৮৯৭০	১৪৪,৩৮১৬০	১৪৪৬৬৫৭৫	৭৫২৭৫২১	×
খাটাউ	৭৯ লাখ ৯৪ হাজার	১০,৩০,২৮৩	৬৫,৭৯০০৮	৫৫৪১২৭৯	১৯৫১৬৩৯	৮৩৬৪৩৭

তাহলে দাঁড়ায় যা মূলধন নিয়োগ করা হয়েছিল তার ১৩।১৪ গুণ শুধু আট বছরেই উশুল হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং সূতাকলগুলির মজুরী বেশী দেবার ক্ষমতাই নেই একথা বলা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। এই সব প্রচণ্ড লাভের মধ্যে কালোবাজারী লাভ নেই। সাদা বাজারে সাদা হিসাবের হিসাব হল এসব। এক বছরেই কাপড়ের বাজার ১০০ কোটির বেশী টাকা কালোবাজারে লুটেছে—পণ্ডিতজীর কথা। তবুও যদি সূতাকলের বেশী দেবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে কি হলে চলে তা জানিয়ে দিলে জনসাধারণ বলি দেবার জন্য নিজের গলা বাড়িয়ে দিতে রাজী আছে।

কংগ্রেসী সরকারের নীতিই হল ধনিকদের মুনাফা বাড়ান আর গরীবদের গলা কাটা। তার ওপর গোদ সর্দি রাজা এখন তাঁর New Economic policy নিয়েছেন—তাতে যে আরও সুবিধা দেওয়া হবে কলওয়ালাদের—সে কথা তিনি জানিয়েও দিয়েছেন। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই কারণ তিনি নিজে যে বোম্বাই সূতাকল রাজাদের নিকট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। শোনা যায়, অবশ্য সঠিকভাবে না জানলেও, দাভাই প্যাটেল নামে জনৈক মন্ত্রীপুত্র বোম্বাই সূতা ও কাপড়ের বাজারের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই সব কারণে যদি সরকারী বস্ত্রনীতির কল্যাণে জনসাধারণ উলঙ্গ হয়ে থাকে, লাখ লাখ সূতাকল শ্রমিক বেকার হয় আর তার বদলে কোটি কোটি টাকা ১০।১২টি ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় তাহলে বলার কিছু নেই। মন্ত্রীরা ভদ্রলোক, নিজেদের জাতভাই, আত্মীয়স্বজনদের ফেলে ত তাঁরা নেংটা, অশিক্ষিত লোকগুলির দিকে তাকাতে পারেন না হক না এই সব বর্বরের দল দেশের লোক সংখ্যার শতকরা ৯৯ জন। এরই নাম কংগ্রেসী গণতান্ত্রিক শাসন।

(৫-র পাতার পর)

সমস্ত দেশের বিশেষ করে ইউরোপের জনগণকে সাবধান করে দেওয়া হয়। সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের জনগণের মুক্ত সংগ্রামের নিশান তুলে ধরা হয় এবং সেই মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে আহ্বান জানান হয়।

১৯৪৮ সালে কমিনফর্মের দ্বিতীয় বৈঠকে যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট-পার্টিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের 'আলসারের' অস্তিত্বকে দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং যথাসময়ে টিটোচক্রের মুখোস খুলে দেওয়া দেওয়া হয়। যুগোশ্লাভ সমস্যা সম্পর্কে কমিনফর্মের সিদ্ধান্ত এবং দলত্যাগী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলনের ফলে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে আরো গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে এবং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-ষ্টালিনের আদর্শের ভিত্তির ওপর

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

"স্বাধীন" ভারতে অনাহারে মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন জবাব মিলিল না। অন্যদিকে যৎকিঞ্চিৎ সারা জীবনে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়া গেল। দুইবেলার বদলে একবেলা আহার চলিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে তাঁহার যে টাকা আছে তাহার বিরুদ্ধে ধার চাহিলেন—জবাব আসিল না। একবেলার আহার দুই-দিনে একবার দাঁড়াইল; পরে তাহাও জুটিল না—চলিল উপবাস। দীর্ঘ দশ মাসের মধ্যে সরকারের একখানি জবাব দিবার ফুরসৎ হইল না। স্ত্রীপুত্র পরিবারকে অন্নের অভাবে তিল তিল করিয়া মরিতে দেখা তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিলেন। নিষ্কৃতি তিনি পাইলেন কিন্তু যে দশটি লোক রহিয়া গেল তাহাদের দুঃখ আরও বাড়িল। স্বাধীন ভারতসরকার সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া কর্ত্তব্য সারিল।

এই ধরণের ঘটনায় ইহা নূতন নয়। আগেও হইয়াছে অনেক। চাকুরীর অভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বেকার যুবক আত্ম-হত্যা করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই কয়েক মাস আগেও কালিঘাট ফলতা লাইট রেলওয়ের জনৈক কর্মচারীর স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন ঢালিয়া অগ্নিদগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—পাঁচদিন ধরিয়া আলো সহ্য করা ও উপবাসী স্বামী পুত্র কন্যাদের শুষ্কমুখ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

শুধু মধ্যবিত্ত পরিবারেই এই দুর্বিসহ অবস্থা নামিয়া আসিয়াছে তাহা নয়—সমাজের শ্রমজীবি অংশের প্রতিটি স্তরই ইহার ইহার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। মধ্যবিত্ত, চাষী, শ্রমিক কাহারও নিস্তার নাই অনাহারের হাত হইতে। মালদহ জিলার আইহো গ্রামের একটি বাড়ীতে জনৈক ভূমিহীন কৃষক অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে—ঐ বাড়ীতে এক-দিনে চারজন ক্ষেতমজুরের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

আর যে কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলায় ইহা ঘটিতেছে তাহা নয়—ভারতের সর্বত্রই এই এক অবস্থা। করিমগঞ্জে শিক্ষিত যুবক চাকরীর দাঁদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। সুরাটে পরিবার পোষণে অক্ষম পিতা নিজ পুত্র দুইটিকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দায়-মুক্ত হইতে চাহিয়াছে, রাণাঘাটে মাতা কন্যা বিক্রয় করিয়া বোঝা হাল্কা করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছে। কংগ্রেসী আইনের বিচারে ইহাদের হয়ত শাস্তি হইবে। কিন্তু দুইদিন আগে যে রঙিন ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন দেখিত সে কেন আত্মহত্যা করিতে যায়? পিতা হইয়া পুত্রকে মারিয়া ফেলিতে বাধে না কেন? স্নেহ-ময়ী মাতাই বা কেন কন্যাকে বিক্রয় করিয়া দায়মুক্ত হইতে চায়? ইহার জবাব সরকারকে দিতে হইবে। ক্ষমতা-গর্বে আজ ইহার জবাব না দিলেও ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবি জনতা যেদিন বিপ্লবের মারফৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চূর্ণ করিয়া জনরাষ্ট্র কায়েম করিবে সেইদিন কড়ায় ক্রান্তিতে সুদ সমেত ইহার খেসারত আদায় করিবে। জনতা তাহার জন্যই ঐক্যবদ্ধ হইতেছে।

কংগ্রেসী সরকারের জাতি গঠনের চেষ্টা

★ বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের জন্য এক বছরে পৌনে দু কোটি টাকা ব্যয়

★ পুলিশ ও সৈন্যখাতে মোট রাজস্বের শতকরা ৫২ভাগ খরচ

★ কিন্তু শিক্ষাখাতে ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা বরাদ্দ হ্রাস

কংগ্রেসী সরকার জাতি গঠনের গুরুদায়িত্বের কথা প্রায়ই বলে থাকে। আর তার প্রধান উপায় যে শিক্ষা বিস্তার তাও অস্বীকার করে না। কিন্তু যখনই সেই বড় বড় কথাকে বাস্তবে কার্য্যকরী করার সময় আসে তখনই দেখা যায় কত ফাঁকা নেতাদের সেই সব বড় বড় বুলি। যে কোন স্বাধীন দেশে শিক্ষা খাতে রাজস্বের একটা মোটা অংশ ব্যয়িত হয়। এমন কি পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকর্ত্তারাও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-খাতে মোট রাজস্বের শতকরা ৯ ভাগ খরচ করত। নেতাদের কথা অনুসারে স্বাধীন ভারতবর্ষে এর চেয়ে বেশী খরচ হওয়াই উচিত। অথচ তা না হয়ে শিক্ষাখাতে ব্যয় কমে গিয়ে দাঁড়াল, মোট রাজস্বের শতকরা ২ ভাগে। কিন্তু তাতেও নেতারা খুসী নয় বাজেটে শিক্ষা-খাতে যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়ে-ছিল তা থেকে আরও ১ কোটি ৫২ লাখ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে মন্ত্রী, সেক্রেটারী আর প্রধান উপপ্রধান প্রভৃতি কর্ত্তা ব্যক্তিদের মাহিনা জোগাবার পর বিশেষ কিছু যে থাকবে তা বলে আর মনে হয় না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবও স্বীকার না করে পারেন নি যে, আগেকার বরাদ্দ টাকাই প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য ছিল তারপর এই ব্যয় হ্রাসের জন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভব হবে না।

ভারতবর্ষে শিক্ষাখাতে ক্রমশঃ এই-ভাবে বরাদ্দ টাকাও কেটে নেওয়া হচ্ছে ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে অথচ বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলির জন্য খরচ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলির জন্য ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এ টাকার মধ্যে বিদেশে অন্যান্য বিভাগের, যেমন ট্রেড কমিশনার শিক্ষা বিভাগীয় অফিসার, সামরিক অফিসার প্রভৃতিদের ব্যয় ধরা হয় নি। এঁদের কারও বেতন বৈদেশিক দূতের চেয়ে কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী। সুতরাং এই সমস্ত শ্বেত হস্তিদের পেছনে কি পরিমাণ অপচয় হচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে। ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্ন এদের বেলায় ওঠে না কিন্তু। শুধু দূতাবাসগুলিই নয়, অহিংসার লীলাক্ষেত্রে গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য-দের রাষ্ট্রে সৈন্য পুলিশ বাহিনীর জন্য মোট রাজস্বের শতকরা ৫২ ভাগ ব্যয়িত হয়। সামরিক বড় কর্ত্তাদের জন্য মদের পেছনে যত খরচ হয় শিক্ষাখাতে তত কি খরচ হয়? জনতা এই প্রশ্নের জবাব চায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ছাঁটাই

আইনত ট্রেডইউনিয়ন অধিকার হইতে কর্মচারীরা বঞ্চিত

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আবার নূতন করিয়া ছাঁটাইএর হিড়িক আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্রে রীতিমত ব্যাপক ছাঁটাই চালু করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে পরিকল্পনা অনু-যায়ী ছাঁটাই করিবার জন্য সরকারী পরি-কল্পনাও গৃহিত হইয়াছে। সরকারের নিজস্ব তদন্ত কমিটির মতে মধ্যবিত্ত পরি-বারের শতকরা ৭৫টি ঋণগ্রস্ত; তাহার উপর প্রতি মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ছাঁটাইয়ের অর্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর অর্দ্ধাহার অনাহারের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিৎ ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া। সরকারের এই জনস্বার্থ বিরোধী নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অনাহারে আত্মহত্যা প্রভৃতি প্রায় নিত্যই ঘটিতেছে। কিন্তু সরকারের তাহার দিকে নজর দিবার অবসর নাই।

সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে যাহারাই আগাইয়া আসিতেছে তাহাদেরই উপর চলিতেছে নিষ্পেষণ ও পুলিশী জুলুম। আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার পর্য্যন্ত সরকার গরীব কর্মচারী-দের দিতে রাজী নয়। ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী হইবার অপরাধে বোম্বাই-র ইণ্ডাষ্ট্রিজ ও সাপ্লাই বিভাগের ছয়জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে; কলিকাতার ডি, জি, ও, এমর অফিসের একজন ইউনিয়ন নেতার কপালে ইহাই জুটিয়াছে। ইহার উপরে আছে 'খারাপ পুলিশ রিপোর্ট' ও 'অকর্ম্মণ্যতার' অজুহাত। কোন অবাঞ্ছিত কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করিতে হইলে তাহার নামে নিজেদের পুলিশ বিভাগ হইতে সরকার বিরোধী বলিয়া একটি রিপোর্ট পাঠাইলেই হইল—সাথে সাথে ছাঁটাইএর খাঁড়া মাথার উপর নামিয়া আসিল। তাহাতেও অসুবিধা থাকিলে মজিমাফিক লিখিয়া দিলেই হইল—অকর্ম্মণ্য। দেখিতে হইবে না দিনকয়েকের মধ্যেই চাকুরী খতম।

ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যয়, সঙ্কোচের নাম করিয়া একদিকে ছাঁটাই ও বেতন কাটা অন্যদিকে এই জুলুমের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে নিছক দমন নীতির জোরে নস্যাৎ করা। এই দুরবস্থা চলিতে থাকিবে যতদিন পুঁজি-বাদী ভারতীয় রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিবে। নিছক কয়েক টাকা মাহিনা বৃদ্ধিতে ইহার সমাধান নাই। মাহিনা কিছু বাড়িলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িবে তাহার তিনগুণ। ইহাই হইল পুঁজিবাদের ধর্ম্ম—শ্রমজীবি মানুষের পকেট পুঁজিবাদীরা হাল্কার উপায়ে কাটিবে। এই কথা বুঝিয়া নিজেদের অঙ্গী সংগঠনের মধ্য দিয়া সংগ্রাম এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক সং-গ্রামের পরিপূরক হিসাবে তাহাকে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে হাঙ্গারীতে কমিনফর্মের তৃতীয় বৈঠকে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হোল সেগুলির উদ্দেশ্য আর একটি নতুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে যতখানি সম্ভব বিশ্ববাসীকে সমবেত করা। কম্যুনিষ্ট, শ্রমিক এবং মেহনতী জনগণের হাতে প্রস্তাবগুলি শান্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের অমোঘ হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। প্রস্তাবগুলি সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় অনারোগ্য রোগ ও ক্রমঃবর্দ্ধমান দুর্বলতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দিয়েছে। প্রস্তাব গুলি শ্রমিক শ্রেণীকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাদের আদর্শ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতে বাধ্য গণতন্ত্রী শিবিরের শক্তি দিন দিন বেড়েচলেছে। স্তালিনের অনুপ্রেরণায় গণ-তন্ত্রীশিবির শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মহান লক্ষ্যের দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েচলেছে।

—টাস্

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

এলবার্ট ডেভিড কোম্পানীর

শ্রমিকদের দেড় মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট

চুক্তিভঙ্গকারী মালিকের পিছনে সরকার

এলবার্ট ডেভিড কোম্পানীর ৭০০ শ্রমিক গত ১৫ই নভেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন। তাঁহাদের প্রধান দাবী হইতেছে—১। ৫৯ টাকা মাগগী ভাতা, ২। দুই মাসের মাহিনা বোনাস, ৩। ইউনিয়ন ও কোম্পানীর মধ্যে পূর্ব্বচুক্তিমত গ্রেড প্রথা ও বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধি চালু, ৪। বর্ত্তমান ফ্যাক্টরী ম্যানেজারকে অপসারণ। এই দাবীগুলির কোনটাই অযৌক্তিক নয়। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের বাজারে ৫০৲ টাকার নীচে মাগগী ভাতা সরকার পর্য্যন্ত দেয় না; চেম্বার ও কমার্স প্রভৃতি আরও বেশী দেয়। সেখানে শ্রমিকদের এই দাবী ন্যূনতম দাবী বলিতেই হইবে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের জিনিস-পত্রের দামের তুলনায় বর্ত্তমানের দাম প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই বর্দ্ধিত মূল্যের অনুযায়ী মাগগী ভাতা দিতে হইলে কমপক্ষে ৮০৲ টাকা দিতে হয়। সেইস্থলে ৪৯৲ টাকা দাবী করিয়া শ্রমিক ভাইরা অনেক কম দাবী করিয়াছেন। তাহার পর কোম্পানীর সহিত ইউনিয়নের চুক্তি হইয়াছিল বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধি করা হইবে। অথচ মালিক পক্ষ সেই চুক্তিকে গ্রাহ্য করিতে রাজী নয়। মালিক শ্রেণীর নীতিই হইতেছে, সময় বুঝিয়া কোন সুবিধামত চুক্তি করা এবং পরে তাহাকে অগ্রাহ্য করা। সরকার ও মালিকরা উৎপাদন বৃদ্ধির আওয়াজ প্রায়ই তোলে এবং ধর্ম্মঘট প্রভৃতির জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপাইয়া দেয়। অথচ ধর্ম্মঘটের অধিকাংশগুলিই আরম্ভ হয় মালিকের পূর্ব্বচুক্তিকে অস্বীকার করা হইতে। এখানেও তাহা হইয়াছে।

পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকার তাহার পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী লইয়া মালিকদের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছে। মালিক পক্ষ যে চুক্তি ভঙ্গকারী তাহাতে কোন দোষ সরকার দেখিতে পায় না, সমস্ত দোষ ভুখা কর্ম্মচারীর; যেহেতু তাহারা রক্ত জল করিয়া খাটিয়া অনাহারে মরিতে নারাজ। পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকারের নিকট হইতে মালিক তোষণ ভিন্ন অন্য কিছু আশা করিলে ভুল করা হইবে। কি adjudication কি ট্রাইব্যুনাল—সরকারী শমননীতির সর্ব্বদাই এই মালিক তোষণ ও শ্রমিক দলন। ট্রাইব্যুনালের মারফৎ শ্রমিকের দাবী আজ পর্য্যন্ত কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সংগ্রাম করিতে হইবে। এলবার্ট ডেভিড কোম্পানীর শ্রমিক ভাইদেরও সেই পথে আগাইতে হইবে। সাধারণের বিশেষ করিয়া নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজেদের বিরুদ্ধে সরকারী জুলুমকে বন্ধ করিতে হইলে শ্রমিক ভাইদের ধর্ম্মঘটী শক্তি ও সংহতিকে যথাসাধ্য আর্থিক, কায়িক ও সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিতে হইবে। ইহার মধ্য দিয়াই বিভিন্ন শ্রমজীবি অংশের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইবে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির আঘাত জোরদার হইবে।

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
ভা ঙ্গা রা প থ
পড়ুন
কার্য্যালয় ঃ—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

জয়প্রকাশী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা

শ্রমিক কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাসের পক্ষে মত দান

রেলওয়ে কর্ম্মচারীর উপর আর একপ্রস্থ আক্রমণ

রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের নেতৃত্ব আর একবার সাধারণ শ্রমিক কর্ম্মচারীর স্বার্থ বিসর্জন দিল। ইহাতে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই; কারণ জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী ও সুবিধাবাদীর দল আজ পর্য্যন্ত প্রতটি ক্ষেত্রেই সাধারণ শ্রমিক কর্ম্মচারীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মচারীরা যখন সারা ভারতব্যাপী ধর্ম্মঘট চালাইয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে তখন এই সুবিধাবাদী নেতৃত্ব সরকারের সহিত গোপন আলোচনা ও শলাপরামর্শ চালাইয়া সেই আন্দোলনকে পিছন হইতে আঘাত হানিয়া বানচাল করিয়া দিয়াছে। শুধু দাবী আদায় বিষয়ে এই বিশ্বাসঘাতকতা তাহা নয়; সরকারের যে ৫০ হাজার শ্রমিক কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করিবার পরিকল্পনা আছে তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও না বলায় এবং পরোক্ষভাবে তাহাকে সমর্থন করায় ইতিমধ্যে ২ হাজার রেলশ্রমিক চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন। ৩ হাজার রেল কর্ম্মচারী শ্রমিক কংগ্রেসী সরকারের দমননীতিতে জেলে পচিতেছেন; তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব উচ্চারণ করে নাই। শ্রীযুত গুরুস্বামী অনুসন্ধান কমিটির সভ্য হিসাবে ৫০হাজার রেল শ্রমিক ছাঁটাই ও গ্রেনশপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষে মত দিয়া সরকারী পরিকল্পনাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এ হেন নেতৃত্ব কখনই সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না।

লক্ষ্য যেখানে মন্ত্রীত্বের গদী সেখানে শ্রমিক কর্মচারীর সংঘবদ্ধ শক্তিকে সেই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগায় সুবিধাবাদীর দল। জয়প্রকাশ, গুরুস্বামীর দল সেই পথে চলিতেছে। তাই শ্রমিক স্বার্থ বিসর্জ্জন তাহারা একটির পর একটি করিয়া দিয়া চলিয়াছে। গ্রেনশপ প্রথা রদ ও ছাঁটাইয়ে মত দেওয়া হইয়া গিয়াছে; এইবার আসিয়াছে মজুরী কাটা। সম্প্রতি শ্রীযুত গুরুস্বামী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সংকট সমাধানে সরকারের সহিত রেল শ্রমিকের সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ প্রতি রেল কর্মচারীকে কমপক্ষে মাসিক এক টাকা করিয়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয় তহবিলে জমা দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে।" চমৎকার ব্যবস্থা! গরীব শ্রমিক কর্মচারীরা এমনিতে অর্থাভাবে অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। তাহার উপর তাহার মজুরী কাটার আরও এক ব্যবস্থা করা হইল। উদ্দেশ্য সরকারের সহিত সহযোগিতা। যে সরকার মেহনতী মানুষের দুঃখ বোঝে না, নিত্য নব করভার তাহার উপর চাপাইতেছে, নূতন নূতন দমন নীতির প্রয়োগে তাহার প্রাথমিক অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লইতেছে, বিনা বিচারে অসংখ্য শ্রমিক কৃষক কর্মীকে কারারুদ্ধ করিতেছে, লাঠি, গুলি, গ্যাসের জোরে তাহাদের বুকের রক্ত টানিয়া বাহির করিতেছে, ছাঁটাই করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে অন্যদিকে ধনিক মালিক শ্রেণীকে মুনাফার পাহাড় ফাঁপাইয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে—তাহাদের উপর ট্যাক্স কমাইয়া দিয়া, র‍্যাসানালাইজেসন প্রথা চালু করিয়া, মজুর মারিয়া,—তাহার সহিত সহযোগিতার প্রশ্নই উঠে না। সহযোগিতার ফল হিসাবে ৫০৲ টাকা মাহিনার কর্মচারীকে ৫৲ টাকার মত খেসারত দিতে হইবে। লাভ তাহার কিছু নাই দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধি ছাড়া; সুবিধাবাদী নেতাদের অবশ্য লাভ আছে—এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে মন্ত্রীত্ব মিলিলেও মিলিতে কিংবা আত্মীয় স্বজনদের মোটা বেতনের চাকুরীও জুটিয়া যাইতে পারে।

সুবিধাবাদী জয়প্রকাশী নেতৃত্ব ইহার বেশী কিছু চায় না। পুঁজিবাদকে কৌশলে বাঁচাইয়া রাখিবার অস্ত্র হইল, সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি। পৃথিবীর সর্বত্র এই ধনিক শ্রেণীর দালালদের রূপ শ্রমিকদের কাছে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে; ব্যবহারের দ্বারা পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের ভারতীয় শাখাও যে সেই একই পথে চলিবে—গরম বুলির আড়ালে মালিক স্বার্থরক্ষা করিবে ও কৌশলে শ্রমিক শক্তিকে বিপ্লবের পথ হইতে দূরে রাখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আর তাই যতদিন রেল শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনের নেতৃত্ব এই সব সুবিধাবাদী পুঁজিবাদের দালালদের হাতে থাকিবে ততদিন শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষিত হইবে না; দাবী আদায় ত হইবেই না। সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে সরাইয়া দিয়া নিজেদের সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তবেই সংগ্রামের মারফৎ দাবী আদায় হইবে, জুলুম বন্ধ হইবে।

সম্পাদক শ্রী[illegible] চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৭ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।